নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Jannkantha
দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০১৯-০৩-০৮, পৃ- ০৪

৭ মার্চের ভাষণ ॥ ইতিহাস কথা কয়

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাঙালীর নয়নের মণি, শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদয়ের ধন শেখ মুজিব। খুলনা ও বর্তমান বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাকে ভাগ করা মধুমতি নদী তীরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন শেখ পরিবারের বড় ছেলে শেখ মুজিবুর রহমান। নিষ্ঠাবান সৎ ও কর্তব্যপরায়ন পিতা শেখ লুৎফর রহমান নিজ জীবনের আদর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েই শিশু-কিশোর মুজিবকে জীবন ও কর্মের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করেন। স্নেহময়ী মাতা সায়েরা খাতুনের মায়া মমতা ছাড়াও হয়ত বা নিজের অজান্তেই ব্যবস্থাপনার দীক্ষা দেন বড় ছেলেকে। রত্নগর্ভা সায়েরা খাতুনের কথা, 'আমার আব্বা আমাকে সম্পত্তি দিয়ে গেছেন যাতে তাঁর বাড়িতে আমি থাকি। শহরে চলে গেলে ঘরে আলো জ্বলবে না, বাবা অভিশাপ দেবে।' পিতা-মাতা ছাড়াও বিদ্যালয়ের বিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী এবং গৃহশিক্ষকের কাছে শেখ মুজিবুর রহমান শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয় বরং জীবন চলার পথে অমূল্য সাংগঠনিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের শিক্ষা গ্রহণ করেন। রাজনীতির দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে। প্রথম দিকে কোন কারণে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে তেমন পছন্দ না করলেও মা, বাবা, গুরুজন ও পাড়ার মুরব্বিগণের পরামর্শে হক সাহেব সম্পর্কে কোন কটু কথা বলা থেকে বিরত থাকেন তিনি।

মহকুমার সেরেস্তাদার শেখ লুৎফর রহমানের কর্মস্থল গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরে শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু করেন। পিতার গলা ধরে না ঘুমালে রাতে তার ঘুম আসত না।

রাজনীতিতে শেখ মুজিবের হাতেখড়ি সেই অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বাংলার একজন বড়মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবের গোপালগঞ্জ সফরকালে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার রোষারোষিতে তাকে কারাগার পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। গ্রামের দরিদ্র আত্মীয় ও অন্যান্য দারিদ্র্য জর্জরিত মানুষের বেদনায় তার মন ভারাক্রান্ত হতো এবং নিজের যথাসর্বস্ব দান করে তাদের দুঃখ দূর করতেন। ছাত্রসংগঠন গঠন, মুসলিম লীগের সংস্পর্শ, স্বদেশী আন্দোলন, ইসলামীয়া কলেজ, বেকার হোস্টেল এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ আর ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতার মধ্য দিয়েই যুবক শেখ মুজিব একজন খাঁটি প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক ও জনদরদী দরিদ্র অন্তঃপ্রাণে নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে তৈরি করেন। সে সময় ও পরবর্তী সময়ে আবারও ব্রিটিশ শাসন শোষণ তিনি দেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে শতকরা ৫৬ ভাগ অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার বরাদ্দে মাত্র ১৫ শতাংশ সম্পদ, চাকরি, সুযোগ ও ক্ষমতার ভাগ দিয়ে বাংলাকে শোষণ, জুলুম ও নির্যাতনে কিভাবে সর্বনাশের শেষ প্রান্তে নিয়ে যায় তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, উপলব্ধির যাতনায় ভুগেছেন আর চূড়ান্ত পরীক্ষায় শান্তিপূর্ণ হলেও জোরদার স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

৭ মার্চের ভাষণের প্রেক্ষিত ও বৈশিষ্ট্য

দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা ধর্মের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রে শুরু থেকেই বাঙালীরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন, সাংবিধানিক কাঠামোতো বাঙালীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং রাজনীতি ও অর্থনীতির স্বার্থরক্ষার আন্দোলন দিনে দিনে তীব্র হয়। পূর্ব বাংলা প্যারিটি ফর্মুলা প্রত্যাখ্যান করে। জনমিতির সংখ্যার অনুপাতেই সকল বিষয়ে শতকরা ৫৬ ভাগ অধিকারের আন্দোলন সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ছ'দফা দাবি তথা বাঙালীর মুক্তি সনদ ঘোষণা করেন। বিশ্ববাসীকে জানান দেয়া হলো যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র টিকে থাকলেও তার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বাসস্থান পূর্ববাংলা প্রায় ষোলোআনা স্বায়ত্তশাসন নিয়েই বিরাজ করবে। উসসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বাংলার দামাল ছেলে মেয়েরা জেলের তালা ভেঙ্গে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে অবশ্যই স্বাধীন বাংলাদেশের অনিবার্যতা নিশ্চিত করে দেয়। আর বাংলার শার্দুল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই যে এতে অপরিহার্য নেতৃত্ব দেবেন তাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকেনি। তারই প্রেক্ষাপটে ডিসেম্বর ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক তথা সদরে মামলাকাত জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হবার ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল ছিল। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ ও সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল- পূর্ব বাংলার জনগণ তথা পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অংশগ্রহণেই ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত হতে পারবেন বলে গোয়েন্দারা তাদের সচরাচরিত 'প্রভু কি শুনতে চান' সে ধরনের প্রতিবেদন দিল। তাকে জানানো হলো যে পূর্ব বাংলার (পাকিস্তানে) শেখ মুজিবুরের আওয়ামী লীগ ১৬৯ আসনের অধিকাংশতে জয়লাভ করবে বটে- তবে অন্যান্য দলের বড় বড় নেতারা যথেষ্ট পরিমাণ আসনে জয়ী হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩১ আসনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ সংযুক্তিতে অন্তত ১৫১টি আসন পাবে। ফলে যে কোয়ালিশন হবে তাতেই শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার বাইরে রাখা যাবে। সে বিশ্বাসে বিভোর হয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া মহাআনন্দে নির্বাচনে গেলেন কারণ, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের (এলএফও) অধীনে ভোটে যেতে রাজি হয়। অবশ্য যেটা তিনি বিশ্লেষণে আনেননি সেটা হলো, 'ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট' এর যে ফর্মুলায় তিনি পাকিস্তানে নির্বাচন করতে প্রথমবারের মতো রাজি হন তার ফলশ্রুতিতে রাজপথে অপ্রতিরোধ্য শেখ মুজিব যে অপরিহার্যভাবেই সারা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যেতে পারেন তা তিনি হিসাবে নেননি। ইয়াহিয়া খানের কাছে গোয়েন্দারা এ তথ্য দেয়নি যে খোদ পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশেই শেখ মুজিবের ন্যায়সঙ্গত ছয় দফার সমর্থক ছিলেন; প্রকৃতপক্ষে অন্তত ৮ (আট) জন এমএনএ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকায় চলে এসেছিলেন এবং শেখ মুজিবকে সমর্থন দিয়ে ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদে যোগদান করতে প্রস্তুত ছিলেন। আওয়ামী লীগ ১৬৭+ পশ্চিম পাকিস্তানের ০৮ জন (মিয়া মমতাজ দওলতানা, মালিক গোলাম জিলানী, আইয়ুব খুরো, আহমদ আলী তালপুর, আব্দুল ওয়াহি খান, গউস বকশ বেজেঞ্জা, খায়ের বকশ মারী ও আতাউল্লা খান মঙ্গল+ ২ (নূরুল আমিন ও রাজা ত্রিদিব রায়)।

ইতোমধ্যে নির্বাচনে পূর্ব বাংলার ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছ'দফার মূলমন্ত্রের ম্যান্ডেট সহকারে ঢাকায় ৩ মার্চের অধিবেশনে যোগ দিতে প্রস্তুত থাকলেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করবেন সেটাই সংবিধান অনুসারে নিশ্চিত ছিল। অবশ্য বঙ্গবন্ধু ঘোষণা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বোমা মেরে লক্ষ জনের মৃত্যু ঘটাতে হলেও রেসকোর্স ময়দানকে খালি করে দেয়া হবে। এ সকল চাপের মুখে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব পরামর্শ দিলেন, 'তোমার মনে যা আসে তাকেই সঠিক সিদ্ধান্ত মনে করে ভাষণ দেবা।'

৭ মার্চের ভাষণের কয়েকটি দিক ও কিছু বিশ্লেষণ

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ, ১৯৭১ এ ১৮ মিনিটের ভাষণটি তার স্বভাবসুলভ তাৎক্ষণিক বক্তব্য ছিল, কোন পূর্বে তৈরি করা বক্তৃতা নয়। এটিকে অনেকেই রাজনীতির কবিতা বলে থাকেন। তুলনা করা হয় আব্রাহাম লিংকন, উইনস্টন চার্চিল, মার্টিন লুথার কিং ও পেরিক্লিসের মহতী যুগান্তকারী ভাষণগুলোর সঙ্গে। এর মহত্ত্ব ও বিরাটত্বের কারণে ২০১৮ সালে জাতিসংঘের এডুকেশন, কালচার ও সাইন্টিফিক অর্গানাইজেশন, ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের অসাধারণ ভাষণটিকে পৃথিবীর অন্যতম 'ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে স্বাধীনতাকামী বাঙালী জাতিকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ভাষণটির অসাধারণত্ব, স্বতঃস্ফূর্ততা, নির্ভীকতা, সম্যক উপলব্ধি ও তেজস্বী উচ্চারণ প্রকৃতপক্ষে বাঙালী জনগণের প্রথমবারের মতো স্বাধীনতার চরম ও পরম আকাঙ্খাকে বাঙময় করে তোলে। ভাষণটি অবশ্যই বহুমাত্রিক গুরুগম্ভীর ও ওজনদার- পরোক্ষভাবে নয় অথচ প্রকৃতপক্ষে বাঙালী ও শেখ মুজিবের স্বপ্ন সাধনার স্বাধীনতা ও মুক্তির সুস্পষ্ট উচ্চারণ এটি। সামগ্রিক বিচারে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করেছে, চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা অর্জনের দিক নির্দেশনা দিয়েছে, প্রকাশ করেছে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রূপরেখা-রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা এবং কল্যাণ রাষ্ট্রে বিশেষ করে কম ভাগ্যবানদের অর্থনৈতিক মুক্তিসহ সোনার বাংলা পড়ে তোলা। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর বলিষ্ঠ প্রত্যয় আছে এ ভাষণের বাক্যগুলির অন্তর অন্তরে। স্বাধীনতা সংগ্রামে চূড়ান্ত আঘাতে বিজয়ের ফসল ঘরে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি- তোমাদের যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে ...'। প্রতিপক্ষ দখলদার বাহিনীর সদস্যদের নিরুৎসাহিত করার মানসে বললেন যে, তারা আমাদের ভাই এবং তারা যেন ব্যারাকে ফিরে যান। 'আর তোমরা গুলি করার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' অন্যথা করলে কি হবে সে রকমভাবেই তিনি চাপ দিলেন, 'আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উদাও আহ্বান 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল...' স্বাধীনতার মহামন্ত্রে উজ্জীবিত লক্ষ কোটি বাঙালীকে বাঁশের লাঠি আর দা কুড়াল নিয়ে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে সুসজ্জিত পাকিস্তানী দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী প্রত্যয় নিয়ে রাস্তায় নেমে আসার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। ইতিহাসের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী যে আপাদমস্তক একজন গণতন্ত্রমনা মহাপুরুষের বলিষ্ঠ প্রমাণ রয়েছে ৭ মার্চের ভাষণে। শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আশা করেছিলেন যে- সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় দেশের দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ শুরু তার পরামর্শক্রমে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সাল তারিখে নির্ধারণ করাই হবে গণতন্ত্রের সর্বজনীন রীতি। ভাষণে তিনি আক্ষেপ করে বললেন, 'তিনি আমার কথা রাখলেন না- রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।' অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতার পরামর্শক্রমে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকা একেবারেই গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে তিনি জানালেন। 'দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীদের আর্তনাদের ইতিহাস।'

একজন ঋনু সমরবিদের মতই বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে নিরাপদ রুটে পিছু হটার সুযোগ করে দেন। ২৫ মার্চের পুনরায় ডাকা সংসদে বসা কেন অসম্ভব তা তিনি ভাষণে যথার্থভাবেই ব্যাখ্যা করে বললেন যে, শহীদের রক্তে রঞ্জিত রাস্তার দাগ তখনও শুকোয়নি। শহীদদের পবিত্র রক্ত পদদলিত করে ২৫ মার্চ তারিখে সংশোধিত সংসদ অধিবেশনে আওয়ামী লীগ যোগদান করতে পারে না। তিনি সংসদে ফিরে যেতে চারটি শর্ত দিলেন : ১. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, ২. যারা ১ মার্চ থেকে হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত তাদের শাস্তি দিতে হবে, ৩. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, ৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

সেই বাঙালীর রক্ত ঝরানো পথে বঙ্গবন্ধু পুনরায় সংসদে যাবার জন্য যে কয়েকটি শর্ত আরোপ করলেন সেগুলোকে নমনীয় বলা যেতেই পারে। তবে এ সকল শর্ত মানা হলে পর বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদের অধিবেশনে গেলে ৩০০ সদস্যের মধ্যে মোট ১৭৭ জন সদস্যের সমর্থন নিয়ে ছ'দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের নতুন সংবিধান রচিত হলে এটি যে, প্রকৃতপক্ষে পূর্ববাংলার স্বাধীনতারই রূপায়ন হতো সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ ছিল না। তাই ইয়াহিয়া-ভুট্টো আঁতাত আলোচনার নামে কালক্ষেপণ ও সশস্ত্র বাহিনীর সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির আয়োজন করেন। কিছু ভাষ্যকারও সব বিষয়ে মুজিববিরোধী দোষারোপ করেন যে, ৭ মার্চের ভাষণে প্রকান্তরে না করে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া উচিত ছিল। বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় হিসাব নিকাশ করেই প্রত্যক্ষ ঘোষণাটি দেননি। কারণ, শতকরা ৫৬ ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। সর্বোপরি সারা পৃথিবীতে বিচ্ছিন্নতাবাদীকে কেউ আমল দেয় না। সে অপবাদ বঙ্গবন্ধু নিতে চাননি। নিতে হয়ওনি। পাকিস্তান ভাঙার দায় পশ্চিম পাকিস্তান তথা সেনা শাসককুলের উপরই পড়েছিল। সারা দুনিয়াতে বাঙালীর ন্যায়ানুগ দাবির প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জেগে ওঠে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা এবং শান্তিপূর্ণভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মত অনুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশলের প্রতি বিশ্বব্যাপী শুভ কামনার জোয়ার সৃষ্টি হয়। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে পাকিস্তানী শাসককুলের গণতন্ত্র পরিপন্থী জবরদস্তিমূলক শাসন চাপিয়ে দেয়ার প্রতি ঘৃণা। জোর সমর্থন ও শুভ কামনায় সিক্ত ও সমৃদ্ধ হয় বাঙালীর গৌরবে উজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি।

৭ মার্চের ভাষণের ওপর কিছু মন্তব্য ও ভাষ্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাসের মহানায়ক বলা হয়। কিন্তু তার ৭ মার্চের অনবদ্য ও বহুমাত্রিকতায় অনন্য ভাষণ তাকেই ইতিহাসের মর্যাদা দিয়েছে। ফিডেল ক্যাস্ট্রো জাতির পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু তোমাকে দেখেছি।' রবার্ট ফ্রস্ট অত্যন্ত আবেগঘনভাবে বঙ্গবন্ধুর ইন্টারভিউ প্রচার করেছেন : আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি কি প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বললেন, 'আই লাভ মাই পিপল'। আর আপনার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কি? সে প্রশ্নের জবাবে হৃদয়বান বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আই লাভ দেম টু মাচ'। সেই হেনরী কিসিঞ্জার বছর দুই আগে বলেছেন, আমি অনেক রাজা, বাদশা, রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের সাক্ষাৎকার পেয়েছি কিন্তু এমন একজন জাতির পিতার দেখা পেয়েছি যার নাম শেখ মুজিব।'

প্রফেসর অনুপম সেন বলেছেন, '১৯৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অসাধারণ ভাষণে বাঙালী জনগণের স্বাধীনতার এই পরম ও চরম আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করেছিলেন, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাঙালীর ওপর অত্যাচারের, নির্যাতনের ও শোষণের চিত্র তুলে ধরেছিলেন অনন্য আবেগে ও তীব্র জ্বালাময়ী ভাষায়।' বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান লিখেছিলেন, "৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক 'গ্রীন সিগন্যাল' বলে মনে হলো।" বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের সৃষ্টিকারী ভাষণ এটি। রাষ্ট্রনায়কের মহিমা ও প্রত্যয়ে যে গভীর মমতা ও আবেগে তিনি বললেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকেই এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত, ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য অন্যান্য যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গবর্নমেন্ট দফতর, ওয়াপদা- কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখ কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।... এরপর যদি একটা গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট, যা যা আছে সবকিছু- আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা ব ন্ধ করে দেবে।"

বঙ্গবন্ধু তার ৭ মার্চের অনুপম ভাষণ শেষ করলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

সেই স্বপ্ন সাধনার বাংলাদেশ আজ জাতির পিতার সুযোগ্য জেষ্ঠ সন্তান জনবন্ধু শেখ হাসিনার পিতার নির্দেশিত পথে উদ্ভাবনী, প্রত্যয়ী, প্রযুক্তিনির্ভর, সামনে থেকে সাহসী ও অসাধারণ নেতৃত্ব দিতে পারার কল্যাণে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মহাসড়কে বিপুল বেগে অগ্রসরমান।

লেখক : বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর